"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ ;
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত ভাষায় ক্ষুদ্রাকৃতি গল্পসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের সন্ধানে আমাদের অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে সেই ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, মহাভারত ও পুরাণের দিকে যেখানে রয়েছে—সত্যকাম-জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, যম-নচিকেতা, ধ্রুব, পরীক্ষিত্, সাবিত্রী-সত্যবান্, দেবযানী-যযাতি-শর্মিষ্ঠা, অম্বা-শিখণ্ডিনী-শিখণ্ডী, নল-দময়ন্তী, কচ-দেবযানী, দেবযানী-যযাতি-শর্মিষ্ঠা, গালব-মাধবী, রুরু-প্রমদ্বরা অথবা শকুন্তলার কাহিনী যা বহুশ্রুত কিন্তু আজও নানাভাবে, নতুন বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে-গীতিতে উপস্থাপিত হয়ে "হৃদয়ে দিয়েছে দোলা", আজও পাঠকের হৃদয়নন্দন হয়ে বিরাজ করছে।

গল্পের ভেতর গল্প এ যেন সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের এক চেনা কথা—সেই অর্থে "পুরো মহাভারতটাই তো জনমেজয়ের মহাগল্প, যার পরতে পরতে গল্পের ভেতর অন্য গল্প ঠাঁই করে নিয়েছিল কোনো না কোনো বক্তব্য বিন্যাসের তাগিদে।"[৩]

বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, অবদান ও জাতক সাহিত্যের অসাধারণ গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতেই পারে।

"সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের আর এক রূপ অলংকৃত দরবারি সাহিত্য-কথা ও আখ্যায়িকা নামে যা পরিচিত।" এক্ষেত্রে সুবন্ধু, বাণভট্ট, কবিরাজ—তিনজনের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। দণ্ডীর দশকুমারচরিতের প্রসঙ্গও উল্লেখনীয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থটি হলায়ুধ মিশ্রের রচনা। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল সম্পর্কিত নানা ঐতিহাসিক তথ্য ও তার পাশাপাশি নানাধরণের লোকরঞ্জক গল্পকথাও উপলব্ধ হয়, পঁচিশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই সেকশুভোদয়া গ্রন্থে।

সংস্কৃত অলংকারসাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যকাব্য অথবা কথা, আখ্যান, পরিকথা, আখ্যায়িকা ইত্যাদির উল্লেখ আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি।

দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে বললেন—

গদ্যং পদ্যং চ মিশ্রং চ
তত্ ত্রিধৈব ব্যবস্থিতম্।।[৪]

অর্থাৎ কাব্য তিন প্রকারে বিভক্ত—গদ্য, পদ্য ও মিশ্র। এই গদ্যকাব্য অর্থাৎ 'পাদবর্জিত অবিচ্ছিন্ন পদপ্রয়োগ' যুক্ত যে গদ্যকাব্য তার দুটি ভেদ—কথা এবং আখ্যায়িকা। তবে পরিশেষে দণ্ডীর মত হল—কথা ও আখ্যায়িকা একজাতীয় কাব্য[৫] দুটি পৃথক সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত। ভামহও গদ্যকাব্যের দুটি ভেদ স্বীকার করেছেন—কথা ও আখ্যায়িকা। রুদ্রটের কাব্যালংকারেও আমরা গদ্যকাব্যের এই দুই ভেদের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করি। অগ্নিপুরাণে গদ্যকাব্যের পাঁচপ্রকার ভেদের কথা উল্লিখিত আছে—

আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথানিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যং চ পঞ্চধা।।[৬]

আখ্যায়িকা, কথা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথানিকা। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনও বিভিন্ন প্রকার গদ্যকাব্যের[৭] উল্লেখ করেছেন। যথা—পর্য্যায়বন্ধ, খণ্ডকথা, পরিকথা, সকলকথা, কথা ও আখ্যায়িকা। অভিনবগুপ্ত বলেছেন বসন্তাদি বর্ণনীয় বিষয়কে উদ্দেশ্য করে প্রবৃত্ত গদ্যকাব্য 'পর্য্যায়বন্ধ'। আর ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থের যে কোনো একটিকে উদ্দেশ্য করে বৃত্তান্ত বর্ণনা 'পরিকথা'।

প্রাকৃতভাষাতে প্রসিদ্ধ গল্পসাহিত্যের দুটি ভেদ—খণ্ডকথা ও সকলকথা। খণ্ডকথাতে ইতিবৃত্তের একাংশের বিবরণ থাকে। ('একদেশবর্ণনা খণ্ডকথা") আর "সকলকথা'তে সমস্তফলযুক্ত সমগ্র ইতিবৃত্তের বিবরণ থাকে "সমস্তফলান্তেতিবৃত্তবর্ণনা সকলকথা"[৮]।

হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যানুশাসনের অষ্টম অধ্যায়ে[৯] প্রথমে কাব্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন—"কাব্যং প্রেক্ষ্যং শ্রব্যং চ"। এর পরে শ্রব্যকাব্যের পাঁচটি ভেদের কথা বলেছেন—

"শ্রব্যং মহাকাব্যমাখ্যায়িকা কথা চম্পূরনিবদ্ধং চ।"

অর্থাৎ শ্রব্যক্যাব্যের ভেদগুলি হল—মহাকাব্য, আখ্যায়িকা, কথা, চম্পূ এবং অনিবদ্ধ। হেমচন্দ্রের মতে কথা কখনও গদ্যময়ী—যেমন কাদম্বরী, কখনও পদ্যময়ী—যেমন লীলাবতী। হেমচন্দ্র তাঁর স্বোপজ্ঞটীকায় আরও বললেন—কথা, বিভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ হতে পারে—সংস্কৃত, মাগধী, পৈশাচী, শৌরসেনী, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ। এরপরে হেমচন্দ্র 'কথা'র বিভিন্ন ভেদের কথাও উল্লেখ করেছেন—আখ্যান, নিদর্শন, প্রবহ্লিকা, মতল্লিকা, মণিকুল্যা, পরিকথা, খণ্ডকথা, সকলকথা এবং উপকথা। সাহিত্যদর্পণকারও কথা ও আখ্যায়িকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১০]

"So the short story as such is not new to Sanskrit, but the form in which it is now handled, Sanskrit owes to the west."

—V. Raghavan

আধুনিক পরিভাষায় ইংরেজিতে যাকে Short story বা বাংলায় ছোট গল্প বা হিন্দীতে 'কহানী' বলা হয় তার সূত্রপাত অবশ্যই একালের ঘটনা এবং বিদেশি short story-র প্রভাব। সংস্কৃতে এই short story-র আক্ষরিক অনুবাদ হয়েছে—'লঘুকথা'।

বিশ-একুশ শতকের সৃষ্টিসম্ভারের দিকে তাকালে দেখি, সংস্কৃত ছোটগল্পের ধারা মোটেই ক্ষীণতনু নয়—বরং গুণগত এবং পরিমাণগত বিচারে উভয়ক্ষেত্রেই ছোটগল্পের মান এবং স্থান বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান লেখিকার হিসেবে বিশ শতকে রচিত সংস্কৃত ছোটগল্পের সংখ্যা হয়তো হাজার বা তারও বেশি। এর বিশাল অংশ অর্থাৎ প্রায় ৭০০টির রচনাকাল স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন 'সংস্কৃত রত্নাকর' (জয়পুর, বেনারস), 'সহৃদয়' (শ্রীরঙ্গম্), 'অমৃতবাণী' (ব্যাঙ্গালোর), 'মধুরবাণী' (ধারওয়ার), 'উদয়নপত্রিকা' (তিরুবয্যরু, তামিলনাড়ু), 'মহারাজ' স স্যান্‌স্‌কৃট্ কলেজ ম্যাগাজিন' (মাইসোর), 'সংস্কৃতচন্দ্রিকা' (কোলাপুর), 'প্রণবপারিজাত' আর কলকাতার দুটি পত্রিকা—'মঞ্জুষা' এবং 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'সংস্কৃত প্রতিভা' (দিল্লি), কথাসরিত্ (এলাহাবাদ) প্রভৃতি। বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা গল্প প্রকাশিত হয়েছে এমন সংকলনগ্রন্থ 'লঘুকথাসংগ্রহ' (জয়মন্ত মিশ্র সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৯৭)—এটি ৬৪টি গল্পের সংকলনগ্রন্থ—যাতে 'রেবত্যুপাখ্যানম্' (মহর্ষি ব্যাস রচিত) সেকালের গল্প থেকে শুরু করে বিষ্ণুশর্মা, শিবদাস, নারায়ণপণ্ডিত, বিদ্যাপতি, বল্লালদেবের ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি থেকে বাছা বাছা গল্পের প্রবহনশীল স্রোত বয়ে চলেছে স্বচ্ছন্দগতিতে। গ্রন্থটিতে একালের গল্পের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে শ্রীলক্ষণ শাস্ত্রী তৈলঙ্গ (উত্তরপ্রদেশ), শ্রীমথুরানাথ শাস্ত্রী, কলানাথ শাস্ত্রী (রাজস্থান), বিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রী (আসাম), রামচন্দ্র মিশ্র (বিহার), আচার্য সুরেন্দ্র ঝা (বিহার), শ্রুতিদেব শাস্ত্রী (বিহার), কাশীনাথ মিশ্র (বিহার), জয়মন্ত মিশ্র (বিহার), গোবিন্দ ঝা (বিহার), জগন্নাথ মিশ্র (বিহার), সুশীলা দেবী (বিহার), পি. রামচন্দ্রডু (অন্ধ্রপ্রদেশ), শ্রীনিবাস দীক্ষিত (অন্ধ্রপ্রদেশ), এইচ. বি. নাগরাজরাও (কর্ণাটক), অমিতা মালবীয়া (উত্তরপ্রদেশ), অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র (উত্তরপ্রদেশ), শ্রী শিবদত্ত পাণ্ডেয় (উত্তরপ্রদেশ), বাবুরাম অবস্থী (উত্তরপ্রদেশ), প্রভুনাথ দ্বিবেদী (উত্তরপ্রদেশ), দুর্গাদত্ত শাস্ত্রী (হিমাচল প্রদেশ), কেশবচন্দ্র দাস (ওড়িশা) এবং সুরেন্দ্রনাথ দেব (পশ্চিমবঙ্গ)—প্রমুখের ছোটগল্প। এছাড়াও রয়েছে কথামুক্তাবলী (ক্ষমা রাও, ১৯৫৪), কথাসপ্তকম্ (নলিনী শুক্ল, ১৯৮৪), বৃহৎসপ্তপদী (দুর্গাদত্ত শাস্ত্রী), কথামৃতম্ (গণপতি শুক্লা, ১৯৮৭) ইত্যাদি।

পট্টকাষ্ঠিকা (কথা দ্বাদশ, ২০০৪)

হাসির একটি গল্প, কিন্তু আপাতহাসির আড়ালে মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, সমাজের অবক্ষয়, আধুনিক সমাজে মূল্যবোধের সংকট এইসব কিছুর একটা বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে এই গল্পটি।

নিজের মুখে গঙ্গাজল দিয়ে যখন পরাণ মণ্ডল ঘড় ঘড় শব্দ করতে আরম্ভ করল, তখন পরাণের মরণকাল আসন্ন ভেবে নিয়ে স্ত্রী বঙ্গমোহিনী পরাণের পরমবন্ধু চরণকে খবর পাঠাল। খবর পেয়ে বাজারে গিয়ে এক গোছা পাটকাঠি নিয়ে উপস্থিত হল বাল্যবন্ধু চরণ—শবদাহের আয়োজনে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে—বন্ধুর অর্থাৎ পরাণের মুখাগ্নি করতে হবে তো? এর পরের ঘটনা? বন্ধু চরণ এবং স্ত্রী বঙ্গমোহিনী সাগ্রহে অপেক্ষা করে পরাণের মৃত্যুর জন্য। চরণের ডাকে সাড়া না দিয়ে পরাণ চুপ করে থাকে—স্ত্রী এবং বন্ধু দুজনে ধরে নেয় পরাণ মৃত। স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদে—"ওগো আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলে—এ—এ।" চিৎকারে জেগে উঠে পরাণ জল চায়। এরপর একে একে কদলীগুচ্ছ, পনস (কাঁঠাল) সে আবদার করে। এক বন্ধু 'আসন্ন মরণ' প্রাণের বন্ধুর কপালে তুলসীপাতা ছোঁয়ায়, স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু আসন্ন ধরে নিয়ে হবিষ্যর জোগাড় করে—কিন্তু তবু পরাণ মরে না। ডাক্তার, বৈদ্য, জ্যোতিষী—সকলে আসেন, নিজেদের প্রাপ্য দক্ষিণা নিয়ে যার যার গন্তব্যে প্রস্থান করেন—কিন্তু পরাণের মরণ দূরস্ত। বিরক্ত, আশাহত, ক্রুদ্ধ স্ত্রী মন্তব্য করে—"অয়ং জীবনে মাং দদাহ, মরণেহপি ধক্ষ্যতি।" অর্থাৎ "এ বেঁচে থেকে সারাজীবন জ্বালিয়েছে—মরণকালে জ্বালাবে।" বিরক্ত ক্রুদ্ধ বন্ধু বলে—আমি এবার যাই—বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ কি? বন্ধুপত্নীর হাতে পাটকাঠির গোছা সমর্পণ করে নিরাশ হয়ে ফিরে যায় চরণ।

এখানেই গল্পের শেষ, গল্পটি পড়তে পড়তে দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়েন পাঠক। সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা যাক অনুবাদ সহযোগে—

'চরণঃ পরাণনিকেতনুপনীতঃ। বঙ্গমোহিনী দ্বারমুদ্‌ঘাট্য সহাস্য জগৌ'

—'ঠক্কুরপুত্র' [চরণ পরাণের বাড়িতে এসে হাজির হল। বঙ্গমোহিনী দরজা খুলে হাসিমুখে বললো—ঠাকুরপো!

পরাণো মৃতঃ?

[পরাণ মরেছে?]

ন অধুনাপি। কিন্তু মরিষ্যতি।

[এখনও মরেনি তবে মরবে।]

—কুত্রাসৌ?

[কোথায় আছে সে?]

—দ্বিতলে।

[দোতলায়।]

—গন্তব্যং ময়া

[চলো যাই।]

—অগ্রে সর। অশৌচে জাতে ভোজনং ন ভবিষ্যতি ইতি ময়া তূর্ণং তত্ সমাপ্যতে। অর্ধং জগ্ধম্। অবশিষ্টং খাদিত্বা আগচ্ছামি।

[তুমি এগোও। অশৌচ হলে তো আর খাওয়া যাবে না। তাই তাড়াতাড়ি খাওয়াটা সেরে নি। আদ্ধেকটা হয়েছে। বাকিটা খেয়েই আসছি। তোমার হাতে কি?]

—পট্টকাষ্ঠিকা।

[পাটকাঠি।]

—তব তুলা নাস্তি। যদনাগতং কিন্তু আগমিষ্যতি সদা তত্র তব নয়নম্।

[সত্যিই, তোমার তুলনা নেই। যা এখনও ঘটেনি, কিন্তু ঘটবেই সেদিকেও তোমার সজাগ দৃষ্টি।]

নারীপুরুষের বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা, রহস্য উন্মোচন করার সার্থক প্রয়াস বেশ কয়েকটি গল্পে।

বিষমপ্যমৃতম্ (কথা দ্বাদশ, ২০০৪)

গল্পে দেখা যায় প্রলম্ব তার লম্বা লম্বা হাত পা দিয়ে যখনই সুযোগ পায় মশক, কুকুর, বেড়াল সবকিছুকে প্রহার করে। যথা কালে তার বিয়ে হয় মন্দাকিনীর সঙ্গে। মন্দাকিনীকে প্রহার করাও একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। প্রহারের মাত্রা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। "তাড়নং ক্রমশো গুরুতরং জাতম্।" "বাঁচাও বাঁচাও", "আমি মরে গেলুম" (গতাস্মি) আমাকে বাঁচাও (রক্ষ মাং) কে আছ, রক্ষা কর বলে চিৎকার করে মন্দাকিনী। কিন্তু প্রতিবেশীরা যখন তাকে সত্যি সত্যি তার স্বামীর হাত থেকে বাঁচাতে আসে মন্দাকিনীই তখন বিপরীত সুর ধরে। "স্বামী তার স্ত্রীকে মারছে। তোমাদের কি?" "স্ত্রীকে প্রহার করায় স্বামীর অধিকার আছে বৈ কি" (ভার্যাপ্রহারে ভর্ত্তুরধিকারোঽস্তি।) যাইহোক, সেই দেশে ছিলেন রামপণ্ডিত—তাঁর উপদেশে প্রলম্ব স্ত্রীকে মারধোর থেকে বিরত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এখন কিন্তু মন্দাকিনী বিমর্ষ—প্রহারহীন স্বামী তার কাছে 'ক্লীব' মাত্র। তার মতে এখন স্বামীর প্রেম অন্তর্হিত—তাই সে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পরিচারিকা গোধাপদী আসে প্রলম্বের গৃহে। ধীরে ধীরে সে প্রলম্বের শয্যাসঙ্গিনী হতে চায়, তার ভার্যার স্থান

অধিকার করতে চায়। তাকে তাড়াতে চাইলেও সে অনড়। সব খবর পেয়ে মন্দাকিনী ফিরে আসে। কিন্তু মন্দাকিনীর ভাষা প্রলম্বের কাছে দুর্বোধ্য। আদরে অনীহা প্রহারে আসক্তি! আবার প্রলম্ব তার পূর্বমূর্তিতে ফিরে আসে। রামপণ্ডিতের উপদেশে—"অথ যদি আহারে তস্যাস্তুষ্টিঃ দীয়তামাহারঃ। যদি প্রহারে কুরু প্রহারম্। ভূতানুরূপো বলিঃ।" অতএব স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রহাররূপ বিষই মন্দাকিনীর কাছে অমৃত সমান। "দম্পতীজীবনং খলু কাব্যমেব।" আর কাব্যে তো ব্যঞ্জনা-লভ্য অর্থই প্রধান—তাই না?

শৈবলী (কথা দ্বাদশ, ২০০৪)

একটি ছোটগল্পের যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার সবই আছে তারাপদ-রচিত 'শৈবলী' গল্পটিতে। রসোত্তীর্ণ একটি ছোটগল্প। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বললেন—"ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ত্ততে"—"রস ছাড়া কোনো বিষয় প্রবর্তিত হয় না।" ভরতপ্রোক্ত নাট্যরস যে শ্রব্যকাব্যেও আস্বাদনযোগ্য—সে কথা আচার্য আনন্দবর্ধন এবং আচার্য অভিনবগুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ছোটগল্পও তো সংস্কৃত আলংকারিকদের দৃষ্টিতে 'কাব্যই' তাই সেখানে রসের আস্বাদন তো হতেই পারে।

করুণরসাত্মক অসাধারণ একটি ছোটগল্প 'শৈবলী'। "রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাত্"— রস বিষয়টি কি? 'রস' এই নাম হয়েছে কারণ এটি আস্বাদিত হয়। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন রসের বর্ণ নির্দিষ্ট করেছেন—করুণরসের বর্ণ ধূসর (কপোতঃ করুণশ্চৈব)। 'শৈবলী' গল্পটির সারা অঙ্গ জুড়ে ধূসরতা, বিষাদময়তা, কারুণ্য। শৈবলী পড়তে শুরু করে শেষ না করে পারা যায় না। 'শৈবলী' শেষ করে আবার শুরুতে না এসে পারা যায় না। পুনরায় শেষ করে আবার শুরুতে আসতে হয়। তাই তো বলছিলাম, শৈবলী রসোত্তীর্ণ একটি ছোটগল্প, করুণরস যার কেন্দ্রবিন্দুতে। 'শৈবলী' গল্পটির সারা অঙ্গজুড়ে যদি বিষণ্ণতা অথবা ধূসরতা তাহলে একে রসোত্তীর্ণ; বলি কি করে।? তার উত্তর তো দেওয়া রয়েছে "করুণাদাবপি রসে জায়তে যত্ পরং সুখম্। সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্"। করুণ প্রভৃতি রসেও যে অত্যন্ত সুখ জন্মায়, সে সম্পর্কে সহৃদয় ব্যক্তির অনুভবই একমাত্র প্রমাণ। "কারণ কোনো সহৃদয় ব্যক্তিই নিজের দুঃখের জন্য কোনো কিছু করেন না। আর করুণ প্রভৃতি রসে সকলেরই ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে এদের সুখময়ত্বই স্বীকার করে নিতে হয়।" করুণরস যদি দুঃখের কারণস্বরূপ হত তাহলে বার বার আমরা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' পড়তাম না, একাধিকবার আমরা সত্যজিত রায়

নির্দেশিত 'পথের পাঁচালী' দেখতাম না। বারবার রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া'র 'সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়' গানটি গাইতাম না, অথবা বার বার শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' পড়ে অশ্রু বিসর্জন করতাম না। তাই আকারে ছোট একটি গল্প যার ছোটপ্রাণ, ছোট ব্যথা....নিতান্তই সহজ সরল...হলে কি হবে—অনেক বড় এর প্রতীয়মান অর্থ, অনেক গভীর এর ব্যঞ্জনা, আর অনবদ্য এর প্রয়োগত্ব বা নাটকীয়ত্ব। তাই বার বার শৈবলী পড়তে পড়তে চোখের জল ফেলতে হয়—আর বারংবার অশ্রু মোচন করতে করতে শৈবলী পড়তে হয়। মনে পড়ে ভট্টতৌতের সেই অসামান্য উক্তি—"প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভবঃ" সেই প্রয়োগত্বের প্রকাশ তারাপদ ভট্টাচার্যের প্রায় প্রতিটি গল্পে উপলভ্যমান। উদারহণস্বরূপ, 'শৈবলী' গল্পটির কয়েকটি পংক্তি অনুবাদ সহ উপস্থিত করা যাক।

"আসীত্ কাচিত্ কন্যকা শৈবলী নাম। কেকরা, কৃষ্ণা, খর্বা চ। বিধাতা যথা তিলোত্তমাং সৃজতি তথা তিলাধমামপি, অন্যথা বিভুত্বং ব্যাহন্যেত। তাং মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা। বর্ধতে চ দিনে দিনে, ন শুক্লপক্ষে যথা শশী, কিন্তু কৃষ্ণায়াং নিস্তারকা অমানিশেব।"—(কথা দ্বাদশ)

"এক যে ছিল মেয়ে—শৈবলী তার নাম। (কেকরা) ট্যারা, কালো আর খর্ব তার আকৃতি। তিলোত্তমা আর তিলাধমা দুইই যে একই বিধাতার সৃষ্টি—অন্যথায় বিভুর বিভুত্ব যে ব্যাহত হয়। মা তাকে কথায় কথায় তিরস্কার করেন, বাবাও কখনো আদর করেন না। শৈবলী বড় হতে থাকে—শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো নয়, কৃষ্ণপক্ষের তারাবিহীন অমাবস্যা রাত্রির মতো।" বাবা বলেন (মাকে উদ্দেশ্য করে) "ভিটেমাটি বিক্রি করলেও তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় হবে না।" মা বলেন—"কে নেবে ওকে? কোনোরকমে বিয়েটা তো হোক, তারপরে না হয় (শ্বশুরবাড়িতে) দাসীগিরি করে বাঁচবে।" ছোট্ট মেয়েটি হাসে—বাবা-মা যেন কি মজার কথা বললেন! উত্তরে মিষ্টি করে শৈবলী বলে—"দাঁড়াও দাঁড়াও দেখ্‌বে যথাসময়ে রাজপুত্র এসে নিয়ে যাবে আমাকে অনেক অনেক দূরে। তখন যেন কেঁদে ভাসিও না।"

—মরণ! গেলে বাঁচি।

—আচ্ছা, দেখবখন।

সাধারণ পাঠক যাঁরা সংস্কৃত তেমন বোঝেন না তাঁরাও এই অনুবাদ পাঠ করে হয়তো মূলের রস কিছুটা আস্বাদন করতে পারছেন।

গল্পকার অসাধারণ বৈদগ্ধ-ভঙ্গী ভণিতি সহযোগে কিভাবে সহজ শব্দের প্রয়োগ করেছেন সুচিন্তিত এবং প্রাসঙ্গিকভাবে। বাল্যাবস্থায় ছোট্ট শৈবলী হাসে—হসতি বালিকা, কৈশোরে যখন, শৈবলী' জগৎকে চিনতে শিখেছে তখন আয়নার সামনে

1634

চোরের মতো দাঁড়ায় 'শৈবলী', (তস্কর ইব দণ্ডায়তে দর্পণস্য পুরতঃ), কপালের চুল সরিয়ে দেয় নিজের হাত দিয়ে (হস্তেন মার্ষ্টি ললাটকেশান্)। এখন কিন্তু আগের মতো হাসে না। 'অধুনা তু ন হসতি কিশোরী।' এরপর বধূ শৈবলী, গোবিন্দ তার স্বামী। মেয়েটি এখন প্রাণপ্রণ চেষ্টা করে অমানুষিক পরিশ্রম করে গোবিন্দর বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য—যেন কিছুটা দাসীর মতো—"ভর্তুঃ পাদুকাং পরিষ্করোতি"—স্বামীর জুতোও পরিষ্কার করে—স্বামী যদি কখনও বলেন "অলমীদৃশপরিশ্রমেণ"—"এত পরিশ্রম কোরো না"। উত্তরে 'ঈষজ্জহাস বধূঃ"—অল্প হেসে শৈবলী বলে "আপনার বাড়ি আমার কাছে মন্দিরের মতো।" হয়তো কৃষ্ণা "অপরাজিতা"র সৌন্দর্য খুব বেশিদিন আর গোবিন্দকে আবিষ্ট করে রাখতে পারে না। একদিন তাই 'শুক্লা' 'চন্দ্রমল্লিকা'-কে নিয়ে বাড়ি ঢোকে গোবিন্দ। তাই অপরাজিতা এখন অনাদৃত—দিন দিন শীর্ণ হয়ে যায় অপরাজিতা। গোবিন্দের কথার উত্তরে শীর্ণ, বিষাদগ্রস্ত শৈবলী "ম্লানং জহাস"—ম্লান হাসে শৈবলী। আর অন্তিম শয্যায় তার স্মিতহাসি—"স্মিতমকরোত্ শৈবলী।"

'হস্' ধাতুটিকে এভাবে আশ্চর্য মুন্সীয়ানায় প্রয়োগ করেছেন তারাপদ—'হসতি', 'ন হসতি', 'জহাস', 'ম্লানং জহাস' ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে।

বাংলার ঘরে ঘরে কালো মেয়ের কথা কোনও নতুন কথা নয়, কালো মেয়ের ব্যথা কোনো অজানা ব্যথা নয়, কালো মেয়ের যন্ত্রণা কোনও অনুপলব্ধ অনুভূতি নয়, দৈনিক পত্রিকার পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপন, অজস্র গল্প, গান প্রভৃতি এর সাক্ষ্য বহন করে। মনে পড়ে জয়গোস্বামী রচিত কবিতা—মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় কবিতার সেই পঙ্‌ক্তি—

বেণীমাধব, বেণীমাধব লেখাপড়ায় ভালো।
শহর থেকে বেড়াতে এলে, আমার রং কালো।

অথবা বনফুলের সেই প্রাণছোঁয়া গল্প যা—কুরূপা কালো মেয়ের যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তুলেছে।

গুরুগম্ভীর চালের অথবা লঘুচালের গল্পই হোক তাঁর প্রতিটি গল্পের ব্যঞ্জনধর্মিতা তারাপদ-প্রতিভার বৈচিত্র্য এবং গভীরতার এক সার্থক ও নিরবদ্য নিদর্শন।

শৈবলী গল্পটিতে ছোট ছোট দু-তিন পদবিশিষ্ট বাক্যের মধ্যে দিয়ে অসাধারণ ছবি এঁকেছেন গল্পকার। "বিররাম বর্ষণম্। জহাস কাশঃ। কাশা বিনাশং গতাঃ। শুশুভে পক্কং শালিধান্যম্। সোহপি অস্তং জগাম হেমন্তঃ। আয়াতঃ শীতঃ। ভয়েন চকম্পে আমলকী শাখা। পত্রাণি ব্যসৃজদ্ ভূমৌ।"

"বর্ষণ বিদায় নিল। কাশফুল হেসে উঠল। কাশ ফুলের দিনও শেষ হল। পাকা শালিধানে (ক্ষেত) ভরে উঠল (হেমন্তে)। হেমন্তেরও হল অবসান। 'এল যে শীতের

Women's College Library
U.G.C. Acce. No. 1636
Rs. 130.00 & Date 27.2.16

বেলা'। 'আমলকীবন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু।' ভূমিতে পাতা ঝরে পড়ার দিন এল।

"দিন পরে যায় দিন"। বছর কেটে যায়। কেকরা, কৃষ্ণা, খর্বা, শৈবলী-কে নিয়ে বছর কাটানোই অনেক। হয়তো 'অপরাজিতা'র মাধুর্য আজ আর পুরুষটিকে আকৃষ্ট করে না। তাই সে গৌরবর্ণা উজ্জ্বল 'চন্দ্রমল্লিকা'কে হাতে করে বাড়ি আসে। অসাধারণ প্রতীক ব্যবহার করে কাহিনীর বিষাদঘন পরিণতির সূচনা করেন তারাপদ। চন্দ্রমল্লিকার আবাহন অপরাজিতার বিসর্জনেরই ইঙ্গিত বহন করে।

'শৈবলী'র জবানীতেই বাংলার শতসহস্র কালো মেয়ের যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তুলেছেন গল্পকার। "মাতঃ, তব বহুকষ্টকারণমহম্ আজন্মনঃ। কিন্তু ন মম করণীয়মাসীত্। ক্ষমস্ব মাম্।" "মা গো, জন্ম থেকে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি—কিন্তু আমার তো কিছু করার ছিল না। আমাকে ক্ষমা কোরো।" কেকরা, কৃষ্ণা, খর্বা কুরূপা শৈবলীর তাই অন্তিম প্রার্থনা পরজন্মে যেন সে চন্দ্রমল্লিকার মতো গৌরবর্ণ সুরূপা হয়ে জন্মায়—জনক, জননী আর স্বামীর তথা সমাজের অনাদর তিরস্কার অবহেলা তাকে যেন স্পর্শ করতে না পারে—তিল তিল করে তাকে যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে না হয়।

শ্যামলী (স.সা.প.প, সংখ্যা ৯১, ২০০৮-২০০৯)

মিষ্টি প্রেমের ছোট্ট একটি গল্প—সরসভঙ্গীতে যার উপস্থাপনা। অন্যান্য গল্পের মতোই শুরু থেকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে তারাপদর গল্প যার পাঠ শেষ না করে পাঠকের নিস্তার নেই।

স্ত্রীর সঙ্গে প্রচণ্ড বাক্‌কলহের পরের দিনই পলাশপুরের শ্রীযুক্ত হরিহর তাঁর পুত্র এম. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নন্দকে ডেকে বললেন—"এবার তোমার বিয়ে দেব। মন দিয়ে পড়াশোনা কর।" এই বলে কদিনের মধ্যেই সস্ত্রীক হরিহর চাটুজ্যে পনসগ্রামের শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন মুখুজ্যের মেয়ে শ্যামলীকে পছন্দ করে এলেন। ফিরে এসে বললেন—"ওখানেই তোমার বিয়ে হবে। তবু নিজে গিয়ে একবার দেখে এসো—যদি কিছু বলার থাকে।"

পাঠক এবার বলুন—এরপর একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত না পড়ে কি মাঝপথে থেমে যাওয়া সম্ভব? এই হল তারাপদ ভট্টাচার্যের গল্প। পাত্র নন্দ, পাত্রী পনসগ্রামের শ্যামলী। নন্দ, নন্দর সহপাঠী এম. এ. প্রথম বর্ষের ছাত্র সুনীল আর বংশী তিনজনের নিবিড় বন্ধুত্ব। তিনবন্ধু মিলে মেয়ে দেখতে যায়। লজ্জায় নতানন পাত্রীর মুখটা ভাল করে দেখে উঠতে পারে না। এরপর বন্ধুদের তারুণ্যসুলভ বুদ্ধিতে চালিত হয়ে শ্যামলীকে ভাল করে দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারল না নন্দ—আবার তারা

পনসগ্রামে এল। জানলা দিয়ে লুকিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল নন্দ। পাত্রীর বাবা নিকুঞ্জবাবু পাত্রের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বহু বিবেচনা করে এ বিবাহ বাতিল করলেন এবং সেই মর্মে নিকুঞ্জবাবু পাত্রের বাবা হরিহরবাবুকে পত্র প্রেরণ করলেন। এদিকে বিবাহ বাতিল হওয়ায় ব্যথিতা শ্যামলী নন্দের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠাল—সে চিঠি এল হরিহরের হাতে। পুত্রের এবং ভাবী পুত্রবধূর হৃদয়ের অভিলাষ পিতার অজানা রইল না। কন্যাকে আশীর্বাদ করে এলেন নন্দের পিতা। আশীর্বাদের গয়না কেনার অবসর নেই—তাই ধান, দূর্বা আর নগদ টাকা দিয়েই কন্যার আশীর্বাদ সম্পন্ন হল। অতঃপর? মধুরেণ সমাপয়েত্।

অত্যন্ত সাদামাটা একটি হাসির গল্প—কি সহজ, সরল ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। গল্পটির মধ্য দিয়ে কয়েকদশক আগেও গ্রামের পরিবারে বাবা-মায়ের নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহের প্রচলিত ধারাকে, ২০/২১ বছরের পাত্রের সঙ্গে এবং ১৮/১৯ বছরের পাত্রীর বিবাহ ইত্যাদি বহুসমাদৃত প্রচলিত সামাজিক ধারাকে মনোরম ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন।

অথ ভেজালকথা (কথা দ্বাদশ, ২০০৪)

বাংলার 'ভেজাল' শব্দটি বহু ব্যবহৃত, বহু প্রচলিত কিন্তু এর মূল অনাবিষ্কৃত—কারণ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর মতো প্রামাণ্যগ্রন্থেও এর মূল অনুল্লিখিত।

আধুনিক জীবনযাত্রার ভেজালসর্বস্বতা, দ্বিচারিতা, ভণ্ডামি বিদ্রূপাত্মক সরস ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন—নারদের সঙ্গে অন্যান্য ঋষিদের বাক্যালাপের ছলে। হাসির ছলে অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গীতে দর্শনের গভীর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। গল্পটির সামান্য অংশের অনুবাদ পেশ করা হল সহৃদয় পাঠকের ঔৎসুক্য নিবারণের অভিপ্রায়ে।

তাঁরা (মুনিরা) বললেন—'ভগবন্'! আপনি তো সম্প্রতি জম্বুদ্বীপে গিয়েছিলেন? সেখানকার কথা একটু বলুন।

নারদ বললেন—তাহলে 'ভেজাল-কথা' শুনুন।

সকলে—'ভেজাল' কাকে বলে?

'উত্তমের সঙ্গে অধম বস্তুর মিশ্রণই হল ভেজাল। আর সেই মিশ্রিত দ্রব্যকেও ভেজাল বলে। যেমন, ব্রাহ্মমুহূর্ত।'

ভুজ্যুঃ —'ব্রাহ্মমুহূর্ত' ভেজাল?

(নারদ)—তাছাড়া কি? সেখানেও তো আলোর সঙ্গে অন্ধকারের মিল হয়—তাই না?

পিপ্পলাদ—জম্বুদ্বীপে কি তাহলে ভেজালের গুরুতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়?

(নারদ)—ঠিক বলেছ। সেখানে স্বাভাবিক বস্তু কিছু নেই বললেই চলে। সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার বীজ মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে। তাই খেয়ে লোকে পটল তুলছে।

সকলে—ছিঃ, ছিঃ।

অজপাদ—কিন্তু ভেজালের কারণটা কি?

(নারদ)—অভাব।

কোকনাদ—অভাব, তো সপ্ত পদার্থের অন্যতম। সে তো থাকবেই। লোকে সেটা মেনে নিচ্ছে না কেন?

হয়শীর্ষ—না রে বাবা। অভাব যে সব সময় কার্যের কারণ হয় তা কিন্তু ঠিক নয়। রামের পত্নীর অভাব ছিল তাও তিনি বিয়ে করেননি। দশরথের পত্নীর অভাব ছিল না, তবু তিনি বিয়ের পিঁড়িতে বার বার বসেছিলেন।

সারসচঞ্চু—আমার এটাই গুণ যে যা বলে তাকেই সত্যি বলে মেনে নি।

মূষিকগ্রীব—এটা তোমার নির্বুদ্ধিতারই সূচনা করে।"

এবিষয়ে নিশ্চিত বলা যায় যাঁরা সংস্কৃত জানেন না তাঁরা অনুবাদেই গল্পটির হাস্যরস প্রাণপণে উপভোগ করছেন আর যারা সংস্কৃত জানেন তাঁরা মূল গল্পটি পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন।

ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা—সর্বত্র খাদ্যাভাব, ভেজাল—সরষের তেলে শিয়ালকাঁটা (সার্ষপতৈলেন শৃগাল-কণ্টকবীজম্), চালে কাঁকড় (তণ্ডুলে কঙ্করম্), চিনিতে বালি (শর্করায়াং বালুকা), ওষুধে ভেজাল (ঔষধে ভেজালম্)—আর অত্যন্ত সরসভঙ্গীতে কটাক্ষবাণে সরকারের এবং সমাজের ওপরতলার নেতাদের মুখোশ খুলতে চেয়েছেন। প্রায় ২০ জন মুনির সঙ্গে নারদ আলাপরত—আলাপচারিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মুনির নামই অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কদলীপ্রিয়, পাণিত্রাস, হয়শীর্ষ, কোটরাক্ষ, সারসচঞ্চু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতেই পারে।

নারীপুরুষের পোষাক পরিচ্ছদ, লোডশেডিং প্রভৃতির প্রতিও বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হয়েছে ছত্রে ছত্রে। কখনও কখনও ন্যায়দর্শনের অভাব, ব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তির কথা কখনও বা বিবাহের বেদমন্ত্র আর কখনও উপনিষদের প্রসঙ্গ—

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেত্।
পূর্ণং ভবতু তত্সর্বম্।"

গদাধরবিবাহকথা (কথা দ্বাদশ, ২০০৪)

'শৈবলী' গল্পটির যেমন প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি শব্দে এক করুণ আবহাওয়া সৃষ্ট হয়, "গদাধরবিবাহকথা' গল্পটিতে তেমন প্রতিটি ছত্রে দমফাটা হাসির খোরাক উপলব্ধ হয়।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে হাস্য রসের বর্ণ নির্দিষ্ট করেছেন সিত অর্থাৎ সাদা। (সিতো হাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ)। সত্যিই নির্মল হাস্যের একটি গল্প "গদাধরবিবাহকথা" হাস্য রস ত্রিবিধ[১১]—বাক্যগত, বেশগত ও ক্রিয়াগত—এখানে বাক্যগত হাস্যের অনবদ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

বাল্যে পিতৃহীন গদাধর মায়ের অত্যধিক আদরে একটি মর্কটে পরিণত হল।[১২] ...ষোলবছর বয়সে 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত পড়া শেষ করে গদাধর যখন দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করল তখন তার 'মা' তাকে পণ্ডিতমশায়ের কাছে নিয়ে এলেন। পণ্ডিতের হজমের সমস্যা আছে। গরুর দুধ তাঁর সহ্য হয় না। বাড়ির দরজায় তাই চারটে ছাগল ঘাস খাচ্ছে। ....তাঁকে অর্থাৎ পণ্ডিতকে মা নমস্কার করলেন। তা দেখে ছেলেও মাটিতে (শুয়ে) পড়ল। মা বললেন—'একে পড়াতে হবে'।

—কি পড়বে?

—পাণিনিব্যাকরণ।

—সেটি কিন্তু কঠিন (বিষয়)।

—অতএব পড়া উচিত।

পণ্ডিত মহাশয়ের তেঁতুলের মতো টক ঢেঁকুর উঠল। মুখবিকৃতি করে নিপুণভাবে ছাত্রকে দেখতে লাগলেন।

—তোমার নাম কি?

—গদাধর। আপনার?

অধ্যাপক ছাত্রের মায়ের মুখের দিকে তাকালেন। সেখানে 'আমি রত্নগর্ভা' এরকম একটি ভাব লক্ষ্য করলেন।

—আজ যাও।

—কবে আসব?

—যখন ইচ্ছে হবে।

—এই পাঠশালার নাম কি?

—গোবর্ধন-চতুষ্পাঠী। (গরুকে বড় করে তোলে যে চতুষ্পাঠী)

—চারটে পাঁঠা এখানে থাকে তাই কি এর নাম চতুষ্পাঠী?

অধ্যাপক স্বগতোক্তি করলেন—'আজ সাতসকালে কি একটা বিশ্রী বস্তুর দর্শন হল'!

মনে হয় যেন কোনো নাটকের সংলাপ পড়ছি। 'গদাধরবিবাহকথা' হাস্যরসের একটি অনবদ্য ছোটগল্প।

তারাপদর প্রতিটি গল্পের মধ্যে দিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ message, কখনও হাসির ছলে, কখনও কারুণ্যের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। 'গদাধরবিবাহকথা'র মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব বড় সহজ কথা নয়। এই গল্পটি পড়তে পড়তে বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের 'চতুর্ণাং পণ্ডিত-মূর্খাণাং কথা'র সেই 'দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি' বা 'সর্বনাশে সমুত্পন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' ইত্যাদি অংশ বার বার মনে পড়ে।

মৈত্রেয়ী (কথা দ্বাদশ, ২০০৪)

অত্যুৎকৃষ্ট রসোত্তীর্ণ একটি ছোটগল্পের যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তারাপদ ভট্টাচার্যের প্রায় প্রতিটি ছোটগল্পেই নিঃসন্দেহে সবকটির সমাবেশ ঘটেছে। তারাপদর গল্প সম্বন্ধে প্রথম এবং প্রধান কথা তাঁর গল্প একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে নিস্তার নেই। আরম্ভ থেকে চুম্বকের মতো টানে—এমনই এর ভাষামাধুর্য—ভাবগাম্ভীর্য।

মাত্র কয়েকপাতার গল্প—মৈত্রেয়ী উদাহরণস্বরূপ বলা যাক[১৩] কোনো একদিন ছোটো একটি ছেলে গৃহস্থের দরজায় এসে হাজির হল। বাড়ির গিন্নি পুকুরঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরছেন। ছেলেটিকে দেখে বললেন—

—কে রে তুই?

—আমার কেউ কোথাও নেই মা।

—মাথা ন্যাড়া কেন রে?

—মা মরে গেছে।

—বাবা?

—আমার জন্মের আগেই চলে গেছে।

—কি চাস্ বাবা এখানে?

—যা হোক্ একটা কিছু কাজ।

—কি কাজ রে?

—যা দেবেন।

—উনি ফিরুন, ফিরলে জিজ্ঞেস করব। এখন এদিকে আয় তো, কিছু খা।

পাঠক বলুন। এর পর গল্পটি শেষ না করে মাঝখানে থামতে পারবেন! এই হল গল্পকার তারাপদ। তারাপদর প্রতিটি গল্প আকারে অতিদীর্ঘ না হলেও তার বক্তব্য কিন্তু অনেকখানি—অর্থাৎ ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিমাধুর্য অসাধারণ।

গল্পের নায়ক একটি বাপ-মা মরা রোগা কালো ছেলে—অনাথ যার নাম। সুদীপ্ত যার দৃষ্টি, সুতীক্ষ্ণ যার মেধা। গৃহস্থ তাকে গৃহে আশ্রয় দিলেন, পড়ার ব্যবস্থা

করলেন—প্রতিটি পরীক্ষায় অনাথের স্থান হল সবার শীর্ষে। গৃহস্থকন্যা বালিকা মালতীর গৃহশিক্ষক হল এই বালক। অচিরেই মদনদেবের প্রভাবে শুরু হল উভয়ের মন দেওয়ানেওয়ার পালা। উভয়ের প্রণয় প্রগাঢ় হল। কিছুকাল পরে অকস্মাৎ মালতীর বাবা-মা উভয়ের মৃত্যু হল নদীপারাপারের সময় নৌকাডুবিতে। ঘটনাচক্রে মালতী এসে পড়ল এক ধনী আত্মীয়ার গৃহে—আত্মীয়ার নাম মৈত্রেয়ী। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হল। মালতীর প্রাণের কথা মনের কথা জানল মৈত্রেয়ী। অনাথের সঙ্গে মালতীর কুন্দফুলের মালা বিনিময়ের পর্বও অজানা রইল না। মৈত্রেয়ীর বিয়ে—অনাথের সঙ্গে। সব দুঃখ বুকে চেপে মালতী শাঁখ বাজাল। বিয়ের রাতে মৈত্রেয়ী গাঁটছড়ার গিঁট খুলে বেরিয়ে গেল। চিঠিতে লিখল—"শ্রদ্ধাস্পদ আমি আপনার মনের কথা জানি না, আপনিও জানেন না আমার কথা। কিন্তু যার সঙ্গে কুন্দফুলের মালা বিনিময় হয়েছিল সেই মালতীকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। তাকে গ্রহণ করুন।"

এখানেই গল্পের শেষ। এমনি সাধারণ একটি প্রেমের কাহিনী পরিবেশন এবং বিন্যাসের গুণে এবং ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার মাধুর্যে একটি অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে 'মৈত্রেয়ী' গল্পটিতে। একদিকে সমাজ ও জীবনের একটি বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে—আর অন্যদিকে প্রেম, সৌন্দর্য এবং কল্পনার এক বিচিত্র এবং অভিনব সমন্বয় পরিদৃশ্যমান হয়েছে। নারীমনের ব্যাপ্তি যে কত আকাশছোঁয়া হতে পারে মৈত্রেয়ী চরিত্রের মাধ্যমে তারই নিরবদ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

গল্পটিতে 'মালতী'র বাবা-মা অর্থাৎ গৃহস্থ ও গৃহিণী, তাঁদের প্রতিবেশিনী এবং মৈত্রেয়ীর মা—এঁদের কোনো নামকরণ করা হয়নি। নামকরণের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ না করে শব্দের connotation যে কতটা ব্যাপক করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের 'মেঘদূত'। মেঘদূতে যক্ষকে কোনো নামের বন্ধনে আবদ্ধ না করে মহাকবি বললেন "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা....যক্ষঃ।" এই যে মহাকবি কালিদাস যক্ষের কোনো নামকরণ করলেন না তার দ্বারা কি তিনি যক্ষ, দেব, দানব, মানুষ নির্বিশেষে সমস্ত বিরহী প্রেমিকের আর্তিকে মূর্ত করে তুললেন না? যক্ষের বেদনা সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বকালের বিরহীজনের আর্তিকে কি অনুরণিত করছে না?

প্রসঙ্গত বলি সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অথ কিম্ নাটকে কোনো চরিত্রের নামকরণ করা হয়নি। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এইভাবে পুরুষচরিত্রগুলির এবং আ ঊ এইভাবে স্ত্রীচরিত্রগুলিকে indentify করা হয়েছে। কোনো চরিত্রের নাম না করে নাট্যকার বুঝিয়েছেন এখানে কোনো ব্যক্তি প্রধান নয়, প্রধান হল party বা দল বা গোষ্ঠী যার সে প্রতিনিধিত্ব করছে।

আবার মৈত্রেয়ী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গৃহস্থ, গৃহিণী অর্থাৎ মালতীর পিতা, মালতীর মা, ধনী আত্মীয়া অর্থাৎ মালতীর আশ্রয়দাত্রী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার স্নেহসিক্ত-হৃদয়া গৃহিণী, স্নেহপ্রবণ এবং দায়িত্বশীল গৃহস্থ, ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশিনী, করুণার্দ্র অন্তরের মৈত্রেয়ীর মা—এ সবই আজও বাংলার পরিবারে যে একেবারে বিরলদর্শন নয়—এই সম্ভবত লেখকের প্রতিপাদ্য।

তারাপদর জন্ম ওপার বাংলায়, তারাপদ জন্মসূত্রে ওপার বাংলার আর পরবর্তীকালে শিক্ষা ও কর্মসূত্রে এপার বাংলার মানুষ, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা আর আলোচ্য গল্পগুলি লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায় তাই সংস্কৃতের এবং বাংলার রথী মহারথী পূর্বসূরী সাহিত্যিকগণের অর্থাৎ কালিদাস, ভাস, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের প্রভাব তাঁর রচনাজুড়ে—হয়তো অজ্ঞাতসারেই স্থান করে নিয়েছে।

প্রসঙ্গত বলি 'শৈবলী' গল্পটিতে নায়িকা শৈবলীর বড় হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে লেখক বললেন—

'বর্ধতে চ দিনে দিনে, ন শুক্লপক্ষে যথা শশী কিন্তু কৃষ্ণায়াং নিস্তারকা অমানিশেব'। মনে পড়ে যায় কুমারসম্ভবের সেই বিখ্যাত শ্লোক যেখানে পার্বতীর বেড়ে ওঠা প্রসঙ্গে মহাকবি বললেন—

"দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।"

এবার মৈত্রেয়ী গল্পটির অনন্য সেই অংশটি উদ্ধৃত করছি—

"চতুর্দশবর্ষীয়া ঊনবিংশ-বর্ষীয়ং নিভৃতং নিনায়। হৃদয়দেশাত্ কিমপি বহিরানীয় আহ—'স্মরসি'?

—কুন্দকুসুমমালা। ত্বয়া গ্রথিত্বা সরস্বতীকণ্ঠে দত্তা।

—ত্বয়া চ রোপিতা লতা।

—মনসি করোমি।

—রক্ষ এনাম্। মা বিজহীহি কদাপি।

বার বার মনে পড়ে যায় শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা শেখর ও ললিতার সেই গাঁদাফুলের মালা বদলের অংশটুকু।

"তখন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালাছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই, চৌকির পিছনে বসিয়া পড়িল। ইতিপূর্বে যে উপায়ে মালাটা সে শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়েই সেই গাঁদাফুলের মালাটা তাহার নিজের গলায় ফিরিয়া আসিয়াছে।" যে গাঁদাফুলের মালা বদলের ঘটনা ললিতা-শেখরের অস্ফুট প্রণয়কে

গাঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল বোধকরি 'মৈত্রেয়ী' গল্পে কুন্দফুলের মালার বিনিময়ও দাত্রী ও গ্রহীতার বন্ধনের অচ্ছেদ্যত্বকে দৃঢ়প্রোথিত করেছিল নিঃসন্দেহে।

অথবা মৈত্রেয়ী গল্পের শেষাংশে অনাথের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর বিবাহ প্রসঙ্গ। মালতী সকলের অলক্ষ্যে কুন্দফুলের মালায় বরণ করেছে যাকে তাকে আজ তুলে দেবে মৈত্রেয়ীর হাতে। এই অংশে গল্পকার বলছেন—

"সায়াহ্নে বর আগতঃ। অনাথ এবাসৌ। মালতী নিগৃহ্য আত্মানং শঙ্খং দধৌ।।"

'মালতী'র যন্ত্রণা অব্যক্তই থেকে যায়, সে শাঁখে ফুঁ দেয়। এই অংশে বার বার পাঠকের মনে পড়বে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের সেই দৃশ্যের কথা—যেখানে পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে চেটীর মাধ্যমে মহারাণীর নির্দেশ অথবা বলা ভাল আদেশ এল—'অস্মাকং ভট্টিনী ভণতি ইমাং তাবত্ কৌতুকমালিকাং গুম্ফত্বার্যা'—বাসবদত্তার বুক ফেটে গেল—সতীনের জন্য মালা গাঁথার ভার পড়ল তাঁরই ওপর। বললেন (আত্মগত) এও আমাকে করতে হল। হায় বিধাতা! কি নিষ্ঠুর তুমি। "...আজ আমার স্বামীও অন্যের হয়ে গেলেন।"

আর রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীতের স্থান তাঁর প্রাণের গভীরে—রবীন্দ্রনাথই তাঁর 'প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।' প্রসঙ্গত বলি, মৈত্রেয়ীর "তুভ্যং কিমপি দাস্যামি ইতি নৃত্যতি মে মনঃ" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়ে দেয় সেই বহুগীত পংক্তিটি "তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন"। 'শৈবলী'র বিবাহিত জীবনে বছর পার হল। তারাপদ বললেন, আয়াত শীতঃ—অর্থাৎ এল যে শীতের বেলা, ভয়েন চকম্পে আমলকী শাখা—'আমলকী বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরুদুরু।'

সাহিত্যের আঙিনায় শাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে। প্রসঙ্গতঃ বলি, বাংলাভাষায় চিরন্তনী বহুশ্রুত, হৃদয়নন্দন কাহিনীকে গল্পাকারে পরিবেশন করেছেন তারাপদ "শাশ্বতীকথা" গ্রন্থে। সেখানে রয়েছে নচিকেতা, ধ্রুব, পরীক্ষিৎ, সাবিত্রী-সত্যবান্, দেবযানী-যযাতি, যযাতি-শর্মিষ্ঠা অম্বা-শিখণ্ডিনী-শিখণ্ডি অথবা নলদময়ন্তীর কাহিনী যা মূল সংস্কৃত উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে বাংলা রূপান্তরে অনন্য ও অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। "নল-দময়ন্তী" কাহিনীতে দময়ন্তী হাঁসের কাছে নলের কথা শুনলেন। তারপর দময়ন্তীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অতিসুন্দরভাবে অলংকারশাস্ত্রোক্ত আটটি সাত্ত্বিকভাবের কথা বললেন। "দময়ন্তীর রাত দীর্ঘতর হল। স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং বেপথু প্রকাশ পেল। বাকি প্রলয়।" ইত্যাদি।

বাংলা প্রবাদ-প্রবচন বাগ্‌ধারা, বাঙালীর সংস্কার সব স্থান করে নিয়েছে—তারাপদর গল্পে।

'মৈত্রেয়ী' গল্পের প্রথমে নায়ক অনাথের প্রবেশ আর নায়িকার মাথায় প্রজাপতি। অর্থাৎ আসন্ন শুভবিবাহের ইঙ্গিত। বাঙালীর সংস্কার—প্রায় বিশ্বাসে পরিণত সংস্কার—প্রজাপতির আগমন পরিবারে শুভসংবাদ আগমনের বা শুভ ঘটনার আবির্ভাবের সূচনা করে। ধান-দূর্বা দিয়ে বর অথবা বধূর আশীর্বাদ বাঙালীসমাজে অতি পরিচিত ঘটনা। তাই পাত্রের পিতা পাত্রীর পিতার উদ্দেশ্যে বলেন—"অগত্যা ধান্যং, দূর্বা, শ্যামলী চ আগমনং কুরু" (শ্যামলী)।

শবদেহের সৎকারের সময় লোহা, নিমপাতা, ধূপ—ইত্যাদির প্রয়োজন—বাঙালীর এ সংস্কারের কথাও রয়েছে 'পট্টকাষ্ঠিকা' গল্পে।

"রাত্রে দন্তকিড়িমিড়িং করোতি" (রাতে দাঁত কিড়মিড় করে) ; (মদনেন কৃতম্)

'দন্তে দন্তান্ নিঘৃষ্য নির্গত' দাঁতে দাঁত ঘষে বেরিয়ে গেল (বিষমপ্যমৃতম্),

নাগরিকা গ্রামীণামপি অতিক্রামতি শ্রমেণ (শহরের মেয়ে কাজেকর্মে গ্রামের মেয়েকেও হার মানায়) (শৈবলী), মুখে গঙ্গাজলং পাতয়িত্বা ঘড়্-ঘড়্-শব্দং কর্তুমারেভে। (গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করতে আরম্ভ করল) (পট্টকাষ্ঠিকা)

"গুণী গুণং বেত্তি" (গুণীই গুণের সমঝদার হয়) (মৈত্রেয়ী) "স এব সময়ঃ সুখে স্বল্পঃ দুঃখে দীর্ঘ আভাতি"—(ইয়ং পৃথ্বী)

সুখের দিন সহজে চলে যায়, দুঃখের দিন কাটতেই চায় না (ইয়ং পৃথ্বী)

"ভিন্নক্ষতে লবণপ্রক্ষেপঃ?" (কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে) (বিষমপ্যমৃতম্)

"সর্পস্য ক্ষুতম্ অহিতুণ্ডিকো বিজানাতি" (সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে) (বিষমপ্যমৃতম) "মম হস্তপাদমুদরং বিশতি" (আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সিধিয়ে যাচ্ছে) (বিষমপ্যমৃতম্)।

"শাকেন মত্স্যং ছাদয়সি" (শাক দিয়ে মাছ ঢাকছ?) (বিষমপ্যমৃতম্) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার তদ্ভব, দেশী, আরবি, ফারসী, ইংরেজি শব্দও অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে তারাপদর সাম্প্রতিক কালের সংস্কৃত ছোটগল্পে। ফরাশ (আরবী ফর্‌শ) ফরাসস্য উপরি আসনং জগৃহুঃ—শ্যামলী), 'চেয়ার' ("ততশ্চেয়ারস্য পৃষ্ঠে দেহং দত্ত্বা চরণাবান্দোলিতৌ চকার" (শ্যামলী), টেবিল ("নন্দঃ টেবিলস্যোপরি কানিচিত্ পুস্তকানি বেণীযুগলমপি দদর্শ"—শ্যামলী), 'বারান্দা' ("ফার্সী-বরাম্‌দহ্, English-veranda বারান্দাতঃ কাচিদ্ বিদ্যুদ্‌বেগেন অভ্যন্তরং বিবেশ"—শ্যামলী)। আধুনিক যুবতীদের যুগোচিত পোশাক—"পূর্বার্ধে হাওয়াই শার্ট নামক পরিধানম্—(অথ ভেজালকথা) লঘুচালে উপস্থাপন করলেন। লেবুর রসে মিষ্টি ও সুগন্ধি মিশিয়ে প্রস্তুত পানীয় Lemonade-কে দ্বিতীয়া বিভক্তি যোগ করে স্বাভাবিক ও সাবলীল প্রয়োগ করেছেন (সুহৃদৌ ধাবন্তৌ লেমনেডম্ আনীতবন্তৌ'—শ্যামলী)। হ্যাজাক,

'আনীতশ্চ হ্যাজাঙ্নামকো বৃহতপ্রদীপঃ—(অথ ভেজালকথা) ডিমের পোচ্ (Egg-poach)-এর পোচং প্রণীতম্—(পট্টকাষ্ঠিকা) ইত্যাদির অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ।

বাংলার অতিপরিচিত বাঙালীর অতিপ্রিয় কচুরী (মহ্যং কচুরীচতুষ্টয়ং দেহি—(পট্টকাষ্ঠিকা), নিম্‌কি, সিঙ্গাড়া (নিমকি, সিঙ্গাড়া তস্যাঃ প্রিয়াঃ—বিষমপ্যমৃতম্), বেগুনী (বেগুনী শীতলা ভবতি—বেগুনী ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—বিষমপ্যমৃতম্) ফুলুরী (ফ-র্-র্ ইতি শব্দায়ামানা ফুলুরী নির্জগাম—বিষমপ্যমৃতম্), সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন ('ভৃত্যঃ কশ্চিত্ সন্দেশরসগোল্লাদীনি প্রত্যেকস্য পুরতো ররক্ষ'— শ্যামলী) অতি সহজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে অনায়াসে অতিস্বচ্ছন্দভাবে স্থান করে নিয়েছে—তারাপদর গল্পে।

প্রসঙ্গতঃ বলি 'পাগল' কথাটি বঙ্গীয় শব্দকোষে অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দরূপে উল্লিখিত। অপরিচিত এবং বহুব্যবহৃত 'পাগল' শব্দটি নানাভাবে বাংলা ভাষার বাগ্‌ধারায়, শব্দপ্রয়োগে উপলব্ধ হয়। তাই পট্টকাষ্ঠিকা গল্পটিতে চরণের 'বৌঠান, পনসটি (কাঁঠালটি) অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু পরাণকে আর দেবেন না। 'ও' সহ্য করতে পারবে না—এই কথার উত্তরে পরাণের স্ত্রী বললো—"পাগল! অবশিষ্ট কাঁঠালটুকু তোমাতে আমাতে খেয়ে নেব।"

বাংলার প্রবাদ-প্রবচনের মতো বাগ্‌ধারাও বারবার সংস্কৃতায়িত হয়ে এসেছে তারাপদর রচনায়—দেওরের প্রতি ঠাকুরপো সম্বোধন—গল্পে হয়েছে—"ঠক্কুরপুত্র (পট্টকাষ্ঠিকা), 'হা' পোড়াকপাল সংস্কৃতায়িত হয়েছে—(হা দগ্ধললাট—বিষমপ্যমৃতম্) ফিক করে হাসা সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়েছে—(ফিক্ ফিক্ জহাস—পট্টকাষ্ঠিকা) ; বৃদ্ধা ফিক্ ইতি হসিত্বা প্রাহ—('শ্যামলী'), নারী ফিক্ ফিক্' ইতি জহাস—(বিষমপ্যমৃতম্) ; ফিক্ ইতি স্মিতং চকার (বিষমপ্যমৃতম্), ছোটবেলায় মার খাওয়া (প্রহারভোজনং কৃতম্—বিষমপ্যমৃতম্)

বেশ কিছু coined word -এর প্রয়োগ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। 'অত্যন্ত রূপবতী' অর্থে 'তিলোত্তমা'-র প্রয়োগ আমরা অনেক জায়গাতেই পাই—এর মূলে পৌরাণিক উপ্যাখ্যানের কথাও তেমন অজানা নয়। কিন্তু 'কুরূপা' অর্থে 'তিলাধমা' একেবারেই তারাপদীয়। 'শৈবলী' গল্পে অসাধারণ প্রয়োগ—"বিধাতা যথা তিলোত্তমাং সৃজতি তথা তিলাধমামপি, অন্যথা বিভুত্বং ব্যাহন্যেত।" 'শৈবলী)।

"চিংড়িপাতরী" (পট্টকাষ্ঠিকা)—অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার—বাঙালীর অতি প্রিয়—তাই বঙ্গমোহিনী স্বামীকে মৃতপ্রায় ধরে নিয়ে শ্রাদ্ধে ভূরিভোজন করানোর প্রসঙ্গে স্বামীর প্রিয় চিংড়ি মাছের পাতরীর কথা ভোলেনি।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ অথবা দর্শনের স্থান তাঁর প্রাণের গভীরে তাই করুণরস অথবা হাস্যরস অথবা যে রসেরই গল্প হোক না কেন, অতি অনায়াস গতিতে,

সাবলীল ভঙ্গিমায় এবং স্বচ্ছন্দ ভাষায় বিভিন্ন তত্ত্বের এবং তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—তারাপদর ছোটগল্পে।

করুণরসাত্মক শৈবলী গল্পে নায়িকা শৈবলীকে তাই মৃত্যুর আগে বলতে শুনি—"আমি শুনেছি মৃত্যুর আগে মানুষ যার কথা ভাবে ঠিক তাই হয়েই জন্মায়—পরের জন্মে। তোমার চন্দ্রমল্লিকাকে, আমার সামনে রাখ।" অর্থাৎ কিনা শৈবলী পরের জন্মে যেন শুভ্রা, সুরূপা, চন্দ্রমল্লিকার মতো সকলের আদরণীয়া হয়—কুরূপা কৃষ্ণা অপরাজিতা হয়ে জন্মাতে আর সে চায় না।

আবার হাস্যরসাত্মক পট্টকাষ্ঠিকাতেও সেই একই প্রসঙ্গে মরণকালে পরাণ 'কলা' খেতে চাইছে। তাই 'কলা' বোধহয় দেওয়াই উচিত। সেই প্রসঙ্গে পরাণের স্ত্রী বঙ্গমোহিনী বলছে—শুনেছি গীতায় আছে যা কিছু মনে করে মানুষ দেহত্যাগ করে পরজন্মে সেই হয়েই জন্মায়। অতএব, 'কলা' যদি না দাও 'কলা'র কথা চিন্তা করতে করতে 'কলা' হয়েই জন্মাবে।

অথচ এই দুটি গল্পই রসোত্তীর্ণ। পট্টকাষ্ঠিকার পাঠক যেমন দমফাটা হাসিতে উচ্ছল হয়ে পড়ে তেমন শৈবলী গল্পের পাঠকের পক্ষেও অশ্রুসংবরণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। করুণরসের প্রসঙ্গে ধ্বনিকার যথার্থই বললেন—

শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবত্।
মাধুর্য্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ।। (ধ্বন্যালোক-২।৮)

বৃত্তিতে আরও পরিষ্কার করে বললেন—

"বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে এবং করুণরসে মাধুর্য্য গুণই প্রকর্ষ লাভ করে। তাহার কারণ হইতেছে—সেখানে সহৃদয়ের হৃদয় অতিরিক্তভাবে দ্রবীভূত হয়।"

সত্যিই শৈবলী পড়তে পড়তে চোখের জল আটকানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কবি Shelley-এর সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে "our sweetest songs are those that tell of saddest thought" এভাবে কোথাও দর্শন, কোথাও জ্যোতিষ অথবা আয়ুর্বেদশাস্ত্র, কোথাও বা অলংকার অথবা ব্যাকরণশাস্ত্রে গভীর প্রবেশ উপলব্ধ হয় তারাপদর গল্পে।

হাসির গল্প পট্টকাষ্ঠিকায় দেখি বঙ্গমোহিনীর স্বামীর মৃত্যু আসন্ন। ডাক্তার আনা হয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে পরাণের স্ত্রীর কথোপকথনের প্রসঙ্গে "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা"-র প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে অতি স্বচ্ছন্দভাবে—অত্যন্ত অনায়াসভঙ্গীতে এবং অনাড়ম্বর ভাষায়। বিশালকায় (ডাক্তার) জিজ্ঞেস করলেন—

—রোগী কোথায়?

—দোতলায়।

—নীচে নিয়ে আসুন।

—পারব না।

—খুব মোটাসোটা?

—আপনার মতো নয়, কিন্তু—

—কিন্তু, কিন্তু করবেন না। আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

—হৃৎকম্প!

—শব্দেরও শক্তি আছে। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' পড়েছেন?

—না

—আচ্ছা, চলুন চলুন।

এর পরে ডেকে আনা হল 'বৈদ্য'কে। বৈদ্য 'পরাণ'কে দেখে বললেন—রোগী ঘুমোচ্ছে।

চরণ বলল—ঘুমোচ্ছে না মরে গেছে?

—'মৃত' হলে আমার আর কিছু করার নেই—আর যদি ঘুমোয় তাহলে তো পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

—কেন?

—কারণ নিদ্রিত কোনো রোগীর ঘুম কখনই ভাঙানো উচিত নয়।

—তাহলে আমরা কি করে জানব—একে নিয়ে যাব (দাহ করার জন্য) নাকি রেখে দেব (জীবিত বলে)?

এরপর বৈদ্য বললেন—"দীপনির্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্। ন জিঘ্রন্তি, ন শৃণ্বন্তি, ন পশ্যন্তি, গতায়ুষঃ। অয়ং দীপনির্বাণগন্ধং জিঘ্রতি?"

অর্থাৎ কিনা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুসারে মৃতদের লক্ষণের কথা বলছেন। "ব্যক্তি যখন প্রদীপ নেভানোর গন্ধ আঘ্রাণ করে না, বন্ধুর বাক্য (হিতোপদেশ বাক্য) শোনে না, যখন অরুন্ধতীকে (নক্ষত্রকে) দেখতে পায় না—তখন বুঝতে হবে ব্যক্তিটির আয়ু শেষ হয়ে গেছে।"

এভাবে হাসির গল্পে যেমন অত্যন্ত serious গল্পেও তেমন অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে অনবদ্য মুন্সীয়ানায় ব্যবহৃত হয়েছে গভীর ও গম্ভীর দর্শনের প্রসঙ্গ।

আগেই বলেছি বাংলাভাষায় ব্যবহৃত দেশী ও বিদেশী শব্দ, বাংলার প্রবাদ, বাগ্‌ধারার প্রয়োগ উপভোগ্য ভঙ্গীতে এসেছে সংস্কৃত ভাষায়। চা চাং দেহি—(তস্মৈ নমশ্চৌরায়), পোড়াকপাল—(দগ্ধললাট—তস্মৈ।)। চা-বিস্কুট (চাং দদৌ, বিস্কুটং তস্মৈ.), এখানে চা গিল্‌বে আর ওখানে গিয়ে সব গোপন কথা ফাঁস করবে (অত্র চাং গিলেত্ তত্র গোপনীয়ম্ উদ্‌গীরেত্—তস্মৈ.)। আমার মাথা খাও, (তস্মৈ.), আমার মাথা (পট্টকাষ্ঠিকা) ইত্যাদির প্রসঙ্গ বার বার মনে পড়ে।

'চা', 'বিস্কুট', পোচ, 'সন্দেশ', 'হ্যাজাক' সব রয়েছে তারাপদর গল্পে।

আগেই বলেছি জন্ম ওপার বাংলার গ্রামে। কিন্তু অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য প্রায় সুদীর্ঘ ৭০ বছর দক্ষিণ কোলকাতার অধিবাসী। বাংলার গ্রাম কিন্তু রয়েছে তাঁর হৃদয় জুড়ে—গ্রাম বাংলার মাটির গন্ধ মিশে রয়েছে তাঁর গল্পের প্রতিটি চরিত্রে—'বাংলার জল'-এর ধারায় সিঞ্চিত, সিক্ত, সুস্নাত তাঁর গল্পের প্রতিটি অনুচ্ছেদ।

তাঁর গল্পে তাই 'কাষ্ঠমার্জারী বৃক্ষমধিরোহতি' (কাঠবেড়ালী গাছে ওঠে—'ইয়ং পৃথ্বী), মা-হারা সাত বছরের গোপাল দীঘীর ধারে, শিরীষ গাছের তলায় সিঁড়িতে বসে অ, আ লেখার অভ্যাস করে, ১৬ বছরের গদাধর পাঠশালায় যায়। যেখানে নারায়ণ পণ্ডিতমশাই-এর উঠোনে ছাগল বাঁধা থাকে (গদাধরবিবাহকথা), কৃষ্ণা কেকরা খর্বকায়া সদ্যযৌবনপ্রাপ্তা শৈবলী বেলফুলের মালা মাথায় দিয়ে শ্মশানাভিমুখী নির্জন রাস্তায় চলে (শৈবলী), বাড়ির গিন্নি পুকুরে স্নান করে বাড়ি ফেরেন (মৈত্রেয়ী), কাকের বাসা আমগাছে (রাধা), অপরাজিতা চন্দ্রমল্লিকা (শৈবলী), কেতকী (রাধা), বকুলফুল (রাধা), ময়ূরপুচ্ছ (রাধা), নিমফুল (মদনেন কৃতম্), চন্দনকাঠ (মদনেন কৃতম্), চাঁদের হাসি (রাধা), বাঁশি (রাধা), বাছুরের দুধ খাওয়া (ইয়ং পৃথ্বী), সব রয়েছে তারাপদর ছোটগল্পে, পাতা ঝরার শব্দও কানে শোনা যায় তারপদর গল্পে বার বার—কখনও অভিধার মাধ্যমে—সোজাসুজিভাবে, কখনও প্রতীকরূপে, কখনও বা রূপকল্পের মাধ্যমে—আর কখনও ধ্বনির আশ্রয়ে।

তারাপদর গল্পে তাই 'ছোটনদী চলে আঁকে বাঁকে' (জীবনতৃষ্ণা), 'শান্তনদীটি যেন পটে আঁকা ছবিটি'। বুকভরামধু বঙ্গের বধূ নদীতে জল আনতে যায় কলসী কাঁখে করে (জীবনতৃষ্ণা), স্ত্রী-কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে স্বামী পুকুরধারে ঘুমোতে যায় (তস্মৈ নমশ্চৌরায়), এম. এ. ফিফ্‌থ্ ইয়ারের ছাত্র 'নন্দ' তাই আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পছন্দের পাত্রী শ্যামলীর বাড়ির দিকে তাকায় (শ্যামলী), নায়িকার বাড়ির জানলার পাশে ধুত্‌রোর বন (শ্যামলী), আর নিমগাছের ওপরে উঠে বসে থাকে নন্দ শ্যামলীকে একবার চোখের দেখা দেখার আশায় আর পলাশপুর গ্রামের হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 'নন্দ'র বিয়ে ঠিক হয় 'পনসগ্রামে'র শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্যমলীর সঙ্গে।

রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে বললেন—"বহুজ্ঞতা ব্যুৎপত্তিঃ ইত্যাচার্য্যাঃ" অর্থাৎ বহুবিষয়ের জ্ঞানের নামই ব্যুৎপত্তি—একথাই আচার্যগণ বলিয়া থাকেন। এই ব্যুৎপত্তি যেন পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে তারাপদ ভট্টাচার্যর মধ্যে। রুদ্রটের ভাষায়—কবির জ্ঞান হবে বিস্তৃত, ব্যাপক। কতটা বিস্তৃত, কতটা ব্যাপক—সে প্রসঙ্গে

রুদ্রট বলেছেন—ব্যুৎপত্তি কথটির মধ্যে ছন্দঃশাস্ত্র, ব্যাকরণ, কলা, লোকস্থিতি, পদ-পদার্থের জ্ঞান সবই এসে পড়ে।

যাইহোক, ব্যাকরণমূলত্বাত্ সর্ববিদ্যানাম্ সত্যিই ব্যাকরণ শাস্ত্রে গভীর প্রবেশের জন্যই বোধহয় অন্যান্য বিদ্যা—যেমন দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায়—অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ এবং মীমাংসা-বেদান্ত প্রভৃতিতে তারাপদর ব্যুৎপত্তি এতটা উচ্চ মানে পৌঁছোতে পেরেছে। প্রসঙ্গতঃ বলি—"ন্যায়দর্শন মতে আত্মা" গবেষণা গ্রন্থের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রানি রামরক্ষী স্বর্ণপদক' লাভ করেছিলেন দার্শনিক তারাপদ, ভারতীয় দর্শন তাঁর 'প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি'।

ছোটগল্প—সার্থক তখনই যখন সে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিদ্বারা সমৃদ্ধ। তারাপদর গল্পে যেন বর্ণে গন্ধে শব্দে ছত্রে সর্বত্র ব্যঞ্জনা—সে করুণ, হাস্য অথবা শান্ত যে রসেরই গল্প হোক না কেন। 'চৌর-নারদ-সংবাদঃ' অর্থাৎ 'চোর ও নারদের কথোপকথন'—আপাত হাসির আড়ালে এক গভীর ব্যঞ্জনাময় গল্প।

উক্ত গল্পটির কিছুটা অংশের অনুবাদ করা যাক—

একদিন একটি চোর নারদের বীণা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল। ধরা পড়ে গিয়ে সে খুব জোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। নারদ বললেন—হ্যাঁরে চোর, কাঁদছিস কেন।

চোর বলল—ধরা পড়ে গেছি তাই (কাঁদছি)

—ভয়ে না লজ্জায়?

—বুড়োর থেকে কখনই ভয় পাই না।

—যদি লজ্জায় কাঁদিস—তাহলে কি অপরাধের জন্য লজ্জা, নাকি পালাতে পারিস নি বলে?

—কোনটাই ঠিক নয়, আমার কার্যসিদ্ধি হল না বলে।

নারদ মনে মনে ভাবল—'আমি তো একবার রত্নাকর দস্যুকে তুলে নিয়ে বল্মীকের (উইএর) মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে তো সে 'সাংখ্যদর্শনের পরিণামবাদ'কে আশ্রয় করে দুধের বিকার যেমন দই তেমনি বল্মীকের বিকার বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর ক্ষেত্রেও কি তাই করব? প্রকাশ্যে বললেন—

—তোর নাম কি রে।

—সাধু।

—ও বাবা! চোরের নাম সাধু।

—উচ্চাবচেষু অর্থেষু নমতি' তাকেই না বলে নাম।

এইভাবে সহজভাবে স্বচ্ছন্দগতিতে এবং অনায়াসে কথোপকথনের মাধ্যমে, 'শব্দ-বুদ্ধি-কর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ', 'তেজীয়সাং ন দোষায়', 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ স যত্প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে', 'প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা' প্রভৃতি ব্যাকরণ, দর্শন অথবা মহাভারত বা কালিদাসের কাব্য থেকে অতি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে—আর একই সঙ্গে চোরের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে।

আরও একটু অংশ ভাবানুবাদ সহযোগে উদ্ধৃত করা যাক্—

—ভবাদৃশে পণ্ডিতে কথং চৌর্যম্?

[আচ্ছা, তোমার মতো পণ্ডিত কি করে চুরি করল?]

—যতশ্চৌর্যং পণ্ডিতকৃত্যম্।

[চুরি করা তো পণ্ডিতদেরই কাজ।]

—তত্র তু ভবানপণ্ডিতঃ।

[কিন্তু তুমি তো পণ্ডিত নও।]

—ধৃত ইতি?

[(কেন)—ধরা পড়েছি বলে?]

—কিমন্যত্?

[তাছাড়া কি?]

'চোর' প্রমাণ করল যুক্তিসহকারে—বড় বড় পণ্ডিত তাঁরাও চোর, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—তিনিও তো চোরই—আর ধনী কৃপণের ধন চুরি সে তো অতিমহৎ কাজ। এর দ্বারা 'অদাতা দাতা ভবতি', 'ধনস্য বিকেন্দ্রীকরণং ঘটতে, ধনক্ষয়াত্তু গর্বী খর্বতি দুর্জনঃ সুজনতি'। ধনের বিকেন্দ্রীকরণ এতো সেই সাম্যবাদের কথা। 'চোরের' কথায় অনুপ্রাণিত নারদ অবশেষে বলেন 'চৌর্যবৃত্তিমাগাম্, উপ মা নয়স্ব'—আমিও চুরি করব—আমাকে নিয়ে চল।

সমাজের চোখে নিম্ন শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে যারা তাদের মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব, শিক্ষাদীক্ষা এবং হৃদয়ের প্রসারতাকে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন গল্পকার তারাপদ—কখনও আয়ুর্বেদ, কখনও বা পাণিনির সূত্র অথবা মহাভাষ্যের 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্', বেদের মধুমতী সূক্ত অথবা মনুসংহিতার "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগে।